একজন মুক্তিযুদ্ধার কিছু কথা

মুক্তিযুদ্ধা মোঃ রহমতুল্লাহ,
কোম্পানী কমান্ডার, ১১ নং সেক্টর ১৯৭১.

অনুলিখন: **নূরুজ্জামান মানিক**

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে বিশেষত মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের অসহনীয় ত্যাগ ও কষ্ট সমন্ধে স্বাধীনতা উত্তর প্রজন্মরা অন্ধকারে আছে বলিয়া আমার ব্যক্তিগত ধারনা। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে সত্য এবং বাস্তব ঘটনাবহুল আলোচনা করিতেছি।

মুক্তিযুদ্ধের আগ হইতেই আমি শেরপুর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং শহর কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। দেশকে স্বাধীন ও শত্রুমুক্ত করিতে পিতামাতা ভাইবোন, স্ত্রী কন্যা সকলকেই ছাড়িয়া ভারতে চলিয়া গেলাম। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে প্রথমে গেরিলা পরে সরাসরি সন্মোখ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছি। স্বাধীনতার জন্য এই দেশের প্রায় সকল মানুষের সমর্থন থাকিলেও মুসলিম লীগ, জামাত এবং নেজামে ইসলাম দলীয় নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। এ সব দলের অনেক নেতাকর্মীর স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থনের মনোভাব থাকিলেও দলীয় নীতির কারণে তাহারা স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান লইতে বাধ্য হয়।

মাওলানা ভাষানী ১৯৪৮ সন হইতেই মনে করিতেন বাংলাদেশ আলাদা রাষ্ট্র হওয়া উচিত। পাকিস্তানী উর্দু ভাষীদের সঙ্গে কোন ভাবেই বাংলা ভাষী বাঙ্গালীদের একত্রে থাকা সম্ভব হইবে না। ১৯৫৪ সন হইতে ১৯৫৭ সন পর্যন্ত তিনি লক্ষ্য করিলেন তাহার হাতে গড়া আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের নেতৃত্ব আশা করে। বাধ্য হইয়া মাওলানা ভাষানী আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ ছাড়িয়া ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) নামে নূতন দল গঠন করিলেন। ১৯৬৮ সনে তিনি ঘৃণাভরে পশ্চিম পাকিস্তানকে ওয়ালাইকুম সালাম জানাইয়া বিদায় নিলেন। সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় সেই সময় যদি ঐ নীতিবাক্য ঠিক থাকিত এবং আওয়ামী লীগ সমর্থন জানাইত তাহা হইলে ১৯৭১ সনে এত প্রাণ, এত রক্ত এবং এত নারীর ইজ্জত দিতে হইত না। অথচ সেই ভাষানী মাওলানার দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেক নেতা কর্মী স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনীর পক্ষ অবলম্বন করিল এবং স্বাধীনতা পরবর্তি সময় হইতে আজ পর্যন্ত সেই অনুসারীরা জামাত-মুসলিম লীগের নেতা কর্মীদের সাথে ক্ষমতা ও অর্থের মোহে এক সাথে রাজনীতি করিতেছে, এমনকি স্বাধীনতা বিরোধীদের ক্ষেত্র বিশেষে প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা-বিবৃতি দিতেছে। রাজনৈতিক বা দলীয় কারণে নিজের নীতি বিসর্জন দেওয়া ছাড়া তাহাদের বোধ হয় কোন উপায় থাকে না। আমি মনে করি নীতি বিসর্জন বা আত্মহত্যা একই পর্যায়ে পড়ে।

আবার দেখিয়াছি স্বাধীনতার পর হইতে আওয়ামী লীগের ২/৩ বার সরকার গঠনেও স্বাধীনতার বিপক্ষ অবলম্বনকারী ব্যক্তিরা মন্ত্রিত্বে স্থান লাভ করিয়াছিল। ক্ষমতায় থাকার জন্য যদি ঘৃণিত ব্যক্তিদেরকে সাথে লইয়া রাজনীতি বা ক্ষমতায় টিকিয়া

থাকার ইচ্ছা জাগে, তবে স্বাধীনতা সংগ্রামটাই আমার দৃষ্টিতে বৃথা মনে হয়। যে সকল ব্যক্তি মুক্তিকামী সাধারণ মানুষ, মুক্তিযোদ্ধা ও বুদ্ধিজীবিদের হত্যাকারী তাহাদের সাথে রাজনীতি, ক্ষমতায় যাওয়ার নীতি, নীতি বিগর্হিত কিনা আমার জানিতে ইচ্ছা করে। বামপন্থি বলিয়া পরিচিত বেশকিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ক্ষমতার বা অর্থের গন্ধ পাইলেই নীতি বিসর্জন দিয়া ক্ষমতাসীন দলে যোগদান করে। ১৯৯১ সনে ১৫ দলীয় জোটে জাতীয় সংসদের নির্বাচন করার পর কয়েকজন সাংসদ ক্ষমতাসীন দলে চলিয়া গেল।

এরশাদ বাঙ্গালী সৈন্যদের নিধনের জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানে সামরিক ট্রাইবুনালের ক্ষমতাধর ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিত। সেই ঘৃণীত এরশাদকে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ড কাউন্সিল ফুলের মালা দিয়া বরণ করিয়াছিল। সব কিছু জানা থাকিলেও তাহাদের লজ্জা বোধ হয় নাই। আবার ক্ষমতার মোহে আতাউর রহমান খান, মসিহুর রহমান যাদু মিয়া, মিজানুর রহমান চৌধুরী, কাজী জাফর আহমেদ, শাহ আজিজুর রহমানের মত ব্যক্তিত্ব নীতি বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার নেতৃত্বে কয়েকজন যোদ্ধা রেকি প্যাট্রোলে দেশের ভিতরে আসিয়া শেরপুরের নালিতাবাড়ী পাক বাহিনীর ক্যাম্প হইতে অতি কৌশলে একটি জীপ গাড়ী লইয়া গিয়াছিলাম। সেই বিরত্ব পূর্ণ অবদান শুধু জয় বাংলা বেতার কেন্দ্র হইতে প্রশংসা সূচক ঘোষণা ব্যতিত আজ পর্যন্তও কিছু পাইলাম না। আমার মত মুক্তিযোদ্ধাদের কোন অর্থ বা ক্ষমতার প্রয়োজন নাই। শুধু চাই মুক্তিযুদ্ধের একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে শান্তিকামী এবং স্বাধীনতা রক্ষার বলিষ্ট কণ্ঠদের সন্তুষ্টি।

অনেক বৎসর পর স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হওয়ার গভীর ষড়যন্ত্র শুরু হইয়াছে। আমার মতে কোন মুক্তিযোদ্ধা চায় না জীবিত থাকিতে চক্রান্তকারীদের পরিকল্পনা ফলপ্রসু হউক। এখনও আমার একটু আত্ম-তৃপ্তি আছে এই জন্য যে দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী পদে স্বাধীনতার সবচেয়ে ঘৃণীত ব্যক্তি গোলাম আজম বা নিজামী স্থলাভিশীক্ত হয় নাই এবং সুর্য সৈনিক মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা সশস্ত্র সালাম গ্রহণ করে নাই।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট এলাকায় অপারেশনে আসিলাম। কিন্তু নিদৃষ্ট সময়ে নিজেদের ক্যাম্পে ফেরত যাইতে পারিলাম না। সকাল হইয়া গেল। সারারাত ছিলাম জঙ্গলে, কাদাযুক্ত ধানের ক্ষেতে এবং কচুক্ষেতে। পাক হানাদার বাহিনীর আনাগোনার চাইতেও দুর্ধষ্য আলবদর বাহিনীর ভয়ে সারা রাত মৃত মানুষের মত প্রচন্ড ঠান্ডা পানিতে কচুরী পানা মাথায় দিয়া পঁচা ডুবায় অবস্থান করিয়াছি। খাওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিলনা বলিয়া সারারাত কিছুই খাওয়া হয় নাই। তবে জীবনের ভয়ে এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক হিসাবে ক্ষুধা ছিল না। এইভাবে রাত শেষ হইল। দিনেতো যাওয়া সম্ভব নয়। সেই অবস্থায় আবার সারাদিন কাটিল শুধু কুচুরী পানার পঁচা পানি পান করিয়া। ইহাতে আমার কোন দুঃখ নাই। দুঃখ হয় তখন, যখন দেখি বা শুনি আলবদর বাহিনী নেতা নিজামী বা মোজাহেদীর হাত দিয়া মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা গ্রহণ করিতে হয়। আক্ষেপ হয় ভাতা নেওয়ার মহুর্তে স্বাধীনতা যুদ্ধের সূর্য সৈনিকদের মৃত্যু হয় না কেন?

সত্য এবং বাস্তব চিন্তা ভাবনার কথা রাজনৈতিক কারণে উপাধীপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা নেতৃবৃন্দ ক্ষমতার অতল গহ্বরে বীরত্ব প্রকাশ করিতেও লজ্জাবোধ করে। রাজনৈতিক ও ক্ষমতা পাকাপোক্তা মনোভাবের কারণেই ক্ষমতাসীন সরকার সমূহ প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের ধোকা দেওয়ার নিমিত্তে ব্যবহার করিয়া থাকে। যাহার ফলে অমুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নেতা হইয়া যায়। তৎপর প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা রদবদল করিতে করিতে তাঁদের নাম সরকারী তালিকায় পাওয়া যায় না।

সমালোচকেরা প্রায়ই বলিয়া থাকে মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতার শতভাগ দাবীদার আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্ধ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হোটেলে মোটেলে রাজকীয় জীবন যাপন করিয়াছে, কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকিতে হইবে মনে করিয়া প্রায় প্রত্যেকেই আমারমত মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতায় তাহাদের পরিবার পরিজন ভারতে লইয়া গিয়াছিল। কোন রনাঙ্গনেই স্বাধীনতাকামী শরনার্থী বা মুক্তিযোদ্ধারা তাহাদের সাহচার্য হইতে যেমন বঞ্চিত ছিল তেমনি আবার বর্তমান বিএনপি নেতা ফরিদপুরের কে, এম, ওবায়দুর রহমান, জামালপুরের মরহুম করিমুজ্জামান তালুকদার, ময়মনসিংহের মরহুম রফিক ভূইয়া, শেরপুরের মরহুম নিজাম, সিলেটের মরহুম মানিক চৌধূরী সহ অনেকেই সর্বদাই রনাঙ্গনে ছিল।

কয়েক বৎসর যাবৎ লক্ষ্য করিতেছি বেশ কিছু মহিলা মুক্তিযোদ্ধা বা বীরাঙ্গনা প্রকাশিত হওয়ার জন্য বিভিন্ন মিডিয়ায় পরিচিত এবং সাক্ষাতকার করিতেছে। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে যুদ্ধের সময় সবচেয়ে বেশী যার অবদান এবং সংবেদনশীল বীর মুক্তিযোদ্ধা চিত্র নায়িকা কবরী অপ্রকাশিত কেন? ইহা কি রাজনৈতিক কারণে না কি অন্য বিষয়ে। কোন রাজনৈতিক দলে থাকিলে নিজেকে ত্যাগি নেতা হিসাবে প্রকাশ করা এবং অতি সত্য ও বাস্তবচিত্র তুলে ধরা সেই দলের হাই কমান্ড পছন্দ করে না। কোন রাজনৈতিক দলের হাই কমান্ড চায় না, তার পরিবারের সদস্য বা ঘনিষ্ট আত্মীয় স্বজন ব্যতিত অন্যকেহ নেতা হিসাবে প্রকাশিত হউক। আমাদের দেশের প্রায় সবগুলি রাজনৈতিক দলই ব্যক্তি কেন্দ্রীক, রাজপরিবার তুল্য। যাহার ফলে দল প্রতিষ্ঠাকারী বা উত্তরাধিকারী ব্যক্তিই সর্বেসর্বা এবং তার পর যাহাতে দলের ক্ষমতা অন্য কোন ব্যক্তির হস্তগত না হয় সেই জন্য পরিবারের সদস্য বা সদস্যদেরকে দায়িত্ব দেওয়ার প্রবনতা বিদ্ধমান। আমার অনেক সময় চিন্তা হয় বর্তমান রাজনৈতিক দল সমূহের হাইকমান্ডের অনুপস্থিতিতে সেই রাজনৈতিক দলটি দেশে টিকিয়া থাকিতে পারিবে কি না।